আকরম খাঁর অবদান

মুহম্মদ মতিউর রহমান

মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক হিসাবে খ্যাত মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ [১৮৬৮-১৯৬৮] ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক বিরল ব্যক্তিত্ব। একাধারে রাজনীতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। এরূপ ক্ষণজন্মা ব্যক্তির আবির্ভাব যে কোন দেশের জন্যই অত্যন্ত গৌরবের। তিনি তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা দেশ ও জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করে গেছেন।

তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমায় মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা হাজী আবদুল বারী খাঁ গাজী। আব্দুল বারী খাঁ নিজে ছিলেন একজন আলেম ও জিহাদী-চেতনা সম্পন্ন মানুষ। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি মাত্র ১০/১২ বছর বয়সে তৎকালীন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে পরিচালিত শিখ ও ইংরেজ বিরোধী জিহাদে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সীমান্ত প্রদেশে গমন করেন। ফলে তিনি “গাজী” খেতাব লাভ করেন। এহেন একজন গাজীর পুত্র হিসাবে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁও ছিলেন জিহাদী মনোভাবাপন্ন এক লড়াকু ব্যত্তিত্ব। তার পূর্ব-পুরুষেরা ছিলেন কুর বা ব্রাহ্মণ। পরবর্তীতে তাঁরা ইসলাম ধর্মের মাহাত্মে মুগ্ধহয়ে ইসলাম কবুল করেন। কথিত আছে, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একই বংশদ্ভূত। উভয়েরই পূর্ব-পুরুষ ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ।

শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ার কারণে মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ভাগ্য-বিড়ম্বিত হন। অতি কষ্ট এবং দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যে তার শৈশব-জীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু তাঁর মনোবল ছিল দৃঢ় এবং তাঁর ছিল প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এ কারণে তিনি নানা দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্রের মধ্যে ও বিদ্যাশিক্ষা চালিয়ে যান এবং কঠোর নিষ্ঠা ও সাধনায় মাদরাসার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত কৃতিত্বের সাথে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯০০ সালে তিনি কলকাতা মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে এফ.এম. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ সময় মাদরাসার সিলেবাস অনুযায়ী আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষা শেখার সুযোগ থাকলেও বাংলা ভাষা শেখার কোন সুযোগ ছিল না। তাই ছাত্র-জীবনে তিনি ইংরেজী-বাংলা শেখার সুযোগ না পেলেও পরবর্তীতে নিজ চেষ্টায় বাংলা, সংস্কৃতি ও ইংরেজী ভাষা রপ্ত করেন। আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষায়ও তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি ফারসিতে কবিতা লেখায় অভ্যস্ত ছিলেন। এ সময় কলকাতা মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন জনৈক ইংরেজ, তার নাম স্টিন। স্টিন সাহেবের উপস্থিতিতে মাদরাসার এক অনুষ্ঠানে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ স্বরচিত ফারসি কবিতা আবৃত্তি করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সে সময় উপমহাদেশে ইংরেজদের রাজত্ব চলছিল। মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। একদিকে ইংরেজ রাজ-শক্তি, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অত্যাচার-নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনায় বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের দুরবস্থা চরমে গিয়ে পৌঁছে। এ অবস্থা দেখে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর হৃদয় রুধিরাক্ত হয়। তিনি এ অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। [তার জীবনের সকল কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা এর প্রতিফলন লক্ষ করি]।

প্রথমত, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান তখন ছিল অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। চাকরি-বাকরী ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারী-জোতদারী সবই ছিল তখন হিন্দুদের হাতে। তৃতীয়ত, সামাজিক ক্ষেত্রেও মুসলমানরা ছিল চরমভাবে উপেক্ষিত-অবহেলিত। চতুর্থত, অশিক্ষার কারণে মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক

দূরে সরে গিয়েছিল। নানারূপ কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের দ্বারা তাদের মন-মানসিকতা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

এ অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ উপায় অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এজন্য তিনি প্রথমেই চিন্তা করলেন লেখালেখি ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে জাগাতে হবে। তাঁর এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তিনি কলকাতার ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হাজী আলতাফের শরণাপন্ন হন। হাজী আলতাফ একজন বড় চামড়া ব্যবসায়ী ছিলেন। কলকাতায় তার একটি প্রেসও ছিল। প্রেসটির নাম ছিল “আলতাফী প্রেস”। হাজী আলতাফ ছিলেন একজন সমাজ-দরদী উদারপন্থী ব্যক্তি। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে তিনি সহযোগিতা করতে রাজী হন। তাঁর সহযোগিতার ফলেই “আলতাফী প্রেস” থেকে ১৯১০ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রথমে “সাপ্তাহিক মোহাম্মদী” পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ সময় থেকে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর কর্ম-জীবনের শুরু। “সাপ্তাহিক মোহাম্মদী” পত্রিকা প্রকাশের সময় “বলকান” যুদ্ধ চলছিল। এ সময় মুসলমানগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মুসলমানদের এ আবেগ ও ক্ষোভের বিষয় “সাপ্তাহিক মোহাম্মদী” পত্রিকায় বিশেষভাবে তুলে ধরার কারণে পত্রিকাটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু ইংরেজ সরকার এ পত্রিকাটি সহ্য করতে পারেনি। তাই সরকারের আদেশে তা অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়। “সাপ্তাহিক মোহাম্মদী” পত্রিকা সরকারের আদেশে বন্ধ হয়ে গেলে পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে এখান থেকেই মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ “আল ইসলাম” নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২২ সালে কংগ্রেসের অসহযোগিতা আন্দোলনের প্রাক্কালে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ “মোহাম্মদী” নামে একটি পত্রিকা বের করেন। কিন্তু সরকার অল্প দিনের মধ্যেই এ পত্রিকাটিও বন্ধ করে দেয়। অতঃপর ১৯৩৭ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর পরিচালনায় এবং সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সম্পাদনায় “দৈনিক আজাদ” পত্রিকা প্রকাশিত হয়। “দৈনিক আজাদ” পত্রিকা বাঙালি মুসলমানের প্রথম দৈনিক পত্রিকা। এ পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালী মুসলমানের রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক জাগরণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তার প্রতিফলন ঘটে। স্বাধীনতা আন্দোলনেও এর ভুমিকা ছিল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ।

এভাবে “সাপ্তাহিক মোহাম্মদী”, “আল ইসলাম”, “মাসিক মোহাম্মদী” ও “দৈনিক আজাদ” পত্রিকার মাধ্যমে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক গৌরবময় অবদান রেখে গেছেন। প্রথমোক্ত দু’টি পত্রিকা স্বল্পায়ু হলেও পরবর্তী দু’টি পত্রিকা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাঙালী মুসলিম সমাজের ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া, তার সম্পাদিত আরো দু’টি স্বল্পায়ু পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথমটির নাম “সেবক” ও দ্বিতীয়টির নাম উর্দু দৈনিক “জামানা”। আজাদী আন্দোলন, মুসলিম নব-জাগরণ ও মুসলমানদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য চিন্তার বিকাশে এসব পত্রিকার অবদান ছিল সীমাহীন। তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গণ-সচেতনতা ও নব জাগরণ সৃষ্টির প্রয়াসেই তিনি সাংবাদিকতার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা অবলম্বন করেছিলেন। সাংবাদিকতার মহান পেশায় নিয়োজিত হয়ে তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর লেখনি যেমন ছিল ক্ষুরধার তেমনি তিনি ছিলেন নির্ভীক। বিভিন্ন সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় লেখার মাধ্যমে তিনি দেশ ও জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দান করেছেন। তিনি নিজে যেমন লিখেছেন, তেমনি অন্যদেরকেও লিখতে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন।

এছাড়া, এসব পত্রিকায় কাজ করার সুযোগ পেয়ে অসংখ্যা মুসলিম প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ সাংবাদিকতায় হাতে-খড়ি লাভ করেন এবং পরবর্তীতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রবীন সাংবাদিকগণ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নিকট বহুলাংশে ঋণী। তাঁদের অগ্রপথিক হিসাবে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর কৃতিত্ব ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। তাই তাঁকে যথার্থই মুসলিম বাংলার “সাংবাদিকতার জনক” হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সাংবাদিকতা পেশাকে সমুন্নত রাখার এবং সাংবাদিকের মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এমনকি এজন্য তিনি আন্দোলন-সংগ্রামও পরিচালনা করেছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ একজন অতিশয় সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রথমে উপমহাদেশের প্রথম রাজনৈতিক দল “কংগ্রেসে” [১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত] যোগদান এবং কংগ্রেসের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে দেশ ও সমাজের কল্যাণে এবং ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে যথারীতি অংশগ্রহণ করেন। কংগ্রেসে থাকাকালীন তিনি খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় মুসলমান প্রজাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি “বঙ্গ প্রজা সমিতি” গঠন করেন। এ সময় তাঁর সম্পাদনায় “সেবক” পত্রিকা প্রকাশিত হয়। [১৯২১]। “সেবক” পত্রিকা “অগ্রসর! অগ্রসর!!” শিরোনামে এক উত্তেজনাপূর্ণ সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখার কারণে ইংরেজ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে এবং পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। অতঃপর তিনি ১৯২১ সালে “দৈনিক মোহাম্মদী” পত্রিকা প্রকাশ করেন। একজন সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি সবসময় জনগণের দাবি-দাওয়ার কথা জোরালোভাবে তুলে ধরতেন। দেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষেও তিনি সর্বদা ছিলেন অতিশয় সোচ্চার। তিনি ছিলেন একজন ওজস্বী ও জ্বালাময়ী বক্তা। ফলে, জনগণের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা ছিল সীমাহীন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে যোগদান করেন। মুসলিম লীগের ঐ অধিবেশনে সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহিত হয়। উক্ত প্রস্তাবের উপস্থাপক ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে-দীন ও ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার হযরত মাওলানা হাসরাৎ মোহানী। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বেও কংগ্রেসের এক অধিবেশনে মাওলানা হাসরাৎ মোহানী ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সংবলিত এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তখন কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা মোহন চাদঁ করম চাদঁ গান্ধীর বিরোধীতার কারণে সে প্রস্তাব পাশ হতে পারেনি। □ডেমিনিয়ন স্ট্যাটাসে□র দাবি নিয়েই তখন পর্যন্ত তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার দাবি নিয়মতান্ত্রিক ভাবে মুসলিম লীগই প্রথম উত্থাপন করে। এ দাবি তখন থেকেই সর্বভারতীয় মুসলমানদের দাবিতে পরিণত হয় এবং ইংরেজ সরকারও তার ফলে মুসলমানদের প্রতি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এর অনেক পরে কংগ্রেস বা ভারতীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ উপমহাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন।

অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন ও বেঙ্গল প্যাক্ট ইত্যাদি বিষয়ে কংগ্রেসের চিন্তাধারার সাথে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর চিন্তাধারায় অমিল হওয়ায় তাঁর মুসলিম লীগে যোগদান ত্বরান্বিত হয়। এ সময় আর একটি বিতর্ক হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে ব্যাপকভাবে উস্কানী দেয়। সেটা হল, ভারতীয় হিন্দু-নেতৃবর্গ প্রায় সকলেই হিন্দুদের নিকট □ঋষি□ নামে খ্যাত চরম মুসলিম-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত □বন্দে মাতরম□ গানটিকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত এবং □শ্রীপদ্ম□কে ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসাবে গণ্য করার দাবি জানায়। এতে মুসলিম সমাজ ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কেননা □বন্দে মারতম□ হিন্দু-দেবীর বন্দনামুলক গান। আর □শ্রীপদ্ম□ও হিন্দু-দেবীর আসন হিসাবে পরিচিত। উভয়ই মুসলমানদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে শিরক হিসাবে গণ্য। ফলে, সমগ্র মুসলিম সমাজ এতে ক্ষুব্ধ হয়। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ মুসলমানদের এই আবেগ ও আকীদার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং তিনি এক্ষেত্রে দু□টির বিরোধীতায় মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। অন্য দিকে হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই গায়ের জোরেই সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের উপর তারা তাদের দাবি চাপিয়ে দিতে দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে থাকে। কংগ্রেস নেতা গান্ধী ও কবি রবীন্দ্রনাথসহ সকল হিন্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই তাদের দাবির ব্যাপারে অনড় ছিলেন।

এদিকে, □বন্দে মারতম□ও □শ্রীপদ্ম□-কে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজের চরম বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের □শ্রীপদ্ম□ অংকিত মনোগ্রামকে পাঠ্য পুস্তক ও কাগজ-পত্রে ব্যবহৃত হতে দেখে মুসলিম ছাত্ররা দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হয় ও প্রতিবাদ করতে থাকে। এ সময় মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর পত্রিকা মাসিক ও সাপ্তাহিক □মোহাম্মদী□তে □শ্রীপদ্ম□ মনোগ্রাম ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসূচক নিবন্ধ লেখা হয়। □শ্রী□ হিন্দুদের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী □সরস্বতী□ এবং □পদ্ম□-কে তার আসন হিসাবে মনে করা হত। এ পৌত্তলিক ভাবধারার মনোগ্রাম কখনো কোনো মুসলমান গ্রহণ করতে পারে না, এটা তাদের ঈমান ও আকীদার খেলাপ। মাওলানা আকরম খাঁ তার বিভিন্ন লেখায় এ সম্পর্কে অকাট্য যুক্তিসহ তার বক্তব্য তুলে ধরেন এবং মুসলমান সমাজ দৃঢ় ভাবে তাঁর পক্ষ সমর্থন করে। কবি রবীন্দ্রনাথসহ অনেকেই □বন্দে মাতরম□ অর্থে দেশ মাতৃকা ও □শ্রীপদ্ম□ অর্থে বাংলাদেশের একটি বিশেষ ফুল বলে ব্যাখ্যা দিলেও মুসলমান সমাজ তা গ্রহণ করেননি। এ আন্দোলনের ফলে দীর্ঘকাল থেকে মুসলমানের নামের আগে হিন্দুরা ইচ্ছাকৃতভাবে যে □শ্রী□ শব্দ ব্যবহার করতো, মুসলমানরা সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং ঐ সময় থেকে তারা নামের আগে □শ্রী□র পরিবর্তে ব্যাপক ভাবে □জনাব□, □মৌলভী□ ইত্যাদি ব্যবহার করা শুরু করে। এটা ছিল মুসলমানদের এক ধরনের সাংস্কৃতিক সচেতনতা। এ সচেতনতাবোধের কারণেই মুসলমানদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ দৃঢ়বদ্ধ হয় এবং পাকিস্তান আন্দোলনেও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও তিনি সদ্য স্বাধীন মুসলিম দেশকে একটি খাটিঁ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য আপ্রান চেষ্টা করে গেছেন।

১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করার পর মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। ঐ সময় থেকে তিনি সর্বতোভাবে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ফলে ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ঐ সময় তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিরও সদস্য নিযুক্ত হন। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে □বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচিত হন। এভাবে মুসলিম লীগের নেতা হিসাবে দীর্ঘকাল তিনি বাঙালী মুসলমান সমাজের খেদমত করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গিত করে দেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও প্রায় অর্ধ-যুগ পর্যন্ত তিনি মুসলিম লীগের নেতা হিসাবে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৪ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তারপরও তাঁর □দৈনিক আজাদ□ পত্রিকা ও □মাসিক মোহাম্মদী□র মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ইসলামী দাবি-দাওয়ার সপক্ষে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তৎকালীন □পাকিস্তান গণ-পরিষদ□ ও □তালীমাতে ইসলামিয়া বোর্ডে□র সদস্য ছিলেন। জেনারেল

আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসনামলে সরকার তাকে ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত করেন। ঐ সময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করার অভিযোগে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং প্রায় আশি বছর বয়সে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দান করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে, সারা জীবন তিনি দেশ, জাতি, জনগণ ও ইসলামের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখে ১৯৬৮ সালে তিনি ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। দেশ-জাতি ও জনগণের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বদা কাজ করে গেছেন। ইসলামের প্রতি তাঁর কমিটমেন্ট ছিল প্রশ্নাতীত। এক্ষেত্রে তিনি সর্বদা যুক্তি ও বিবেকের অনুশাসন মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো মোস্তফা চরিত্র রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর একটি জীবনী গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় রচিত সীরাত গন্থসমূহের মধ্যে এ গ্রন্থটি নানা কারণে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এর ভাষা, সংগৃহীত তত্ত্ব-তথ্য ও বিবরণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তবে দুএকটি ক্ষেত্রে বিতর্কমূলক বিষয় স্থান লাভ করায় অনেকে এ গ্রন্থটির কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর রচিত তফসিরুল কোরআন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

> মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর রচিত মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ইতিহাস, বাঙালি মুসলমানের সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা, তাদের অধঃপতন ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক গভীর ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। তাঁর-ইসলাম বিষয়ক রচনাবলী গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। মুসলমানদের তাদের ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তাদেরকে নব-জাগরণে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য তিনি তার লেখনি পরিচালনা করেছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ একাধারে বাংলা, আরবি, ফারসি, উর্দু ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এছাড়া ইংরেজী ভাষায়ও তাঁর সামান্য দখল ছিল। মাদরাসায় বাংলা ভাষা শেখার সুযোগ না পেলেও নিজের চেষ্টায় তিনি বাংলা ভাষার চর্চা করে এক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এটা তাঁর অসাধারণ প্রতিভারই পরিচয় বহন করে। তিনি বাংলা ভাষা আয়ত্ব করেছিলেন শুধু তাই নয়, বাংলা গদ্যের তিনি ছিলেন এক অনন্য-সাধারণ শিল্পী। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাদি এর স্বাক্ষর বহন করে। তিনি একজন আলেম এবং আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভাষা অনেকটা সংস্কৃতানুগ ও ক্লাসিক-ধর্মী। ফলে তা যেমন ওজস্বিতা সম্পন্ন, তেমনি অলংকারবহুল ও কাব্যগুণমণ্ডিত।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ একাধারে ছিলেন রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সমাজ সংস্কারক। এ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। তবে তাঁর সকল কর্ম-প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজের নব-জাগরণ ও উন্নয়ন। তিনি ছিলেন একজন যুক্তিবাদী। যুক্তির সাথে গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা তাঁকে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। তিনি একজন আলেম হলেও অনেকের মত গোঁড়া বা পশ্চাৎমুখী ছিলেন না। সাগ্রসর চিন্তা ও আধুনিক মন-মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাই তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সকলের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। সমকালীন সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সাথে তিনি গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হলেও পরবর্তীতে এটা উপলব্ধি করেন যে, কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়ে কখনো মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। তাঁর এ উপলব্ধি আসার সাথে সাথে তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করে ১৯০৬ সালে গঠিত ভারতীয় উপমহাদেশের একমাত্র মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগে যোগদান করেন । মুসলিম লীগে যোগদান করার পরই তাঁকে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সভাপতি নিযুক্ত করা হয় এবং তার নেতৃত্বে অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পাকিস্তান আন্দোলনও জোরদার হয়। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৩৭ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বাংলায় মুসলিম লীগ বিশেষ সাফল্য অর্জন করে।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি বাংলা গদ্য-সাহিত্যের একজন কালজয়ী অমর প্রতিভা। মুসলিম বাংলার নব-জাগরণের ক্ষেত্রে তার অবদান অবিস্মরণীয়। তাই, আমাদের জাতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ও বহু মাত্রিক অবদান সম্পর্কে যথার্থ মূল্যবান হওয়া একান্ত অপরিহার্য।

সূত্রঃ সাহিত্য ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণ, মাওলানা আকরম খাঁ স্মরণ, জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০০৫

মুহম্মদ মতিউর রহমান

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান এর জন্ম ৩ পৌষ, ১৩৪৪ (১৯৩৭ ইং) সন, সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুর থানার চর নরিনা গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস উক্ত একই উপজেলার চর বেলতৈল গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সনে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।
কর্মজীবনে তিনি সিদ্বেশ্বরী কলেজ ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে অধ্যাপনা করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকল্পে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সংগঠক হিসেবে তাঁর রয়েছে বৈচিত্রময় ভূমিকা। তিনি ঢাকাস্থ "ফররুখ একাডেমীর" প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য।
তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য কথা (১৯৯০), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৭০), সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৭১), মহৎ যাদের জীবন কথা (১৯৮৯), ইবাদতের মূলভিত্তি ও তার তাৎপর্য (১৯৯০), ফররুখ প্রতিভা (১৯৯১), বাংলা সাহিত্যের ধারা (১৯৯১), বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন (১৯৯২), ইবাদত (১৯৯৩), মহানবী (স) (১৯৯৪), ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৯৫), মহানবীর (স) আদর্শ সমাজ (১৯৯৭), ছোটদের গল্প (১৯৯৭), Freedom of Writer (১৯৯৭), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (২০০২), মানবাধিকার ও ইসলাম (২০০২), ইসলামে নারীর মর্যাদা (২০০৪), মাতা-পিতা ও সন্তানের হক (২০০৪), রবীন্দ্রনাথ (২০০৪), স্মৃতির সৈকতে (২০০৪)। এছাড়াও তাঁর সম্পাদনায় ফররুখ একাডেমী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।